কবির সোনালি অন্ধকার

জাকারিয়া প্রীণন

ঐতিহ্য

ছোটফুফা মৃত মঞ্জুরুল হক মুঞ্জু পিতা সাইফুল ইসলাম দিপু
এবং কবি ও চিত্রশিল্পী নির্ঝর নৈঃশব্দ্যকে

মানুষ মূলত ঋতু আক্রান্ত ফুল; অবলীলায় ফুটে থাকে মনে ও মগজে

খণ্ড–৫ আকার খিয়ো

কবিতা কী?—নানামাত্রিক মত ও বিবাদে আজও এই প্রশ্নের কোনো চূড়ান্ত মীমাংসা বা সুরাহা হয়নি। এবং বোধকরি তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কোনো কালেই সম্ভব নয়। কারণ প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মন ও মননের বদল হয় তেমনি পাশাপাশি মুহূর্তেই পালটে যায় কবিতা বিষয়ক ভাবনা। যার ফলে আদিকাল থেকে এখন পর্যন্ত নানান জনে কবিতাকে নানান রকম অভিধায় সজ্ঞায়িত করেছেন। কবিতা কী? বা কবিতা কাকে বলে? কিংবা তার বিষয় বস্তু কী? আমার এই গ্রন্থে এসব বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলিনি। এবং এসকল প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজতে যাইনি কোনোদিন। ফুলের সৌন্দর্য দেখে তার সৌরভ উপভোগ করেছি কিন্তু কোনোদিন প্রশ্ন করিনি ফুল তুমি সুন্দর কেন? সৌরভ তুমি মিষ্টি কেন? তবে কেউ যখন বলে কবিতা কী? বা কবিতা কাকে বলে? তখন আমার মনে প্রথমে যে কথাটি আসে কবিতা—কল্পনাজাত বিরলবোধ; আত্ম আয়নার ঝলমল করে ওঠা টুকরোটুকরো অনুভব। আর তখনই আমি দ্বারস্থ হই পিকাসোর—'Everyone wants to understand art. Why not try to understand the songs of a bird? Why does one the night, flowers, everyone around one, without try to understand them?' পাবলো পিকাসোর এই বক্তব্যে কবিতা সর্ম্পকিত সকল প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে যাই। তবে কবিতা আমার কাছে মৃদু একটি দোলা— কী যেন কী বয়ে গেল হৃদয়ে। যেন সে কোনো নীলচক্ষু বিড়াল। তার দিকে তাকিয়ে আমি তলিয়ে যেতে পারি ভ্যান গঘের রঙের দুনিয়ায়। যেন প্যান্টের পকেটে লুকিয়ে রাখা কামিনীর দীর্ঘশ্বাসে— নীল নীল অপূর্ব সৌরভ হাওয়া দিচ্ছে রেনে ম্যাগ্রিৎ-এর বিশাল ক্যানভাসের চোখে; তার ওপর দিয়ে টগবগ করে চলে যাচ্ছে পিকাসোর ঘোড়া। এখানে আমি শব্দ হাতে নেমেছি কবিতার সন্ধানে। শিল্প ও শিল্পীর ভালো মন্দ র্নিণয়ে কবিতা ও কবিতার আলোচনা বা সমালোচনা এদের আসলে প্রকৃত সম্পর্ক কী, তারা কী একে অপরের সাথে সংযুক্ত অথবা উভয়ের মধ্যে জ্ঞাতিশত্রুতা আছে? যেহেতু কাব্য সমালোচনায় হাত দিয়েছি এই প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতেই হয়। কবিতার কাজ হচ্ছে হৃদয়ের, সে হৃদয়ে রস জন্ম দেয়— আর সমালোচনার কাজ মস্তিষ্কের, অনেকটা দার্শনিকের মতোই তার কাজ বুদ্ধিবৃত্তিক। যিনি আলোচক বা সমালোচক তিনিও কিঞ্চিৎ পরিমাণে রসস্রষ্টা; তার ভিতর রসবোধ আছে বলেই তিনি কবিতা

অবগাহন করতে সক্ষম হন। আবার যিনি রসস্রষ্টা তিনিও কিঞ্চিৎপরিমাণে সমালোচক ও বিচারক যার ফলে কবিতার নতুন নতুন চিন্তা ও প্রকরণ আমরা পাচ্ছি তা না হয় আমাদের কবিরা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ত কবিতার হাজার বছরের ইতিহাসে। আল্লাহ যখন আদমকে সৃষ্টি করেন তখন ফেরেশতারা বলেছিল মানুষ বানানোর কী এমন দরকার? আমাদের মহিমা কীর্তন তোমার জন্যে যথেষ্ট নয়? আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেছিলেন আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। আল্লাহর আদেশে আদমের সামনে কতগুলো পাত্র রাখা হলো। আল্লাহ যখন ফেরেশতাদের পাত্র গুলোর নাম জিজ্ঞেস করলেন তখন কেউ সেগুলোর নাম বলতে পারেনি। কিন্তু আদম এক এক করে সবগুলোর নাম বলে দিলেন— তাঁর আইডিয়োলজির ব্যবহার দিয়ে। আল মাহমুদ তার কবির কররেখা গ্রন্থে কোরআনের এই ঘটনাটি উদ্ধৃত করে বলেন 'মানুষ মাত্রই কবি'। তার মানে এটা খুব সহজ করেই বোঝা যায় যে, কবিতা কোনো নাজিলকৃত বিষয় নয় কল্পনা ও অভিজ্ঞতার বিষয়। বস্তুদৃষ্টির অভিজ্ঞতা থেকে নিঃসৃত কল্পনাজাত বিরলবোধই হলো কবিতা। যিনি সেই বিরলবোধের রিয়ালিস্টিক ধারণা দিতে পারেন তিনিই কবি। তাই বলে কবি আর নবী এক কথা নয় নবীরা হয়ে থাকেন সাম্প্রদায়িক তারা বিশেষ একটি নিয়ম ও নীতির অনুসারী। কবিরা অসাম্প্রদায়িক তারা পূর্বনির্ধারিত কোনো নিয়ম ও নীতির অনুসারী নন বা প্রচারক নন। বরং কল্পনার আবহে নিত্য-নতুন আবিষ্কারে মগ্ন থাকেন প্রকৃতির আধারে। আদমের এই ঘটনা থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সৃষ্টিকর্ম আর সৃষ্টিকর্মের বিচার, বিশ্লেষণ, মূল্য বা ধারণা— সব একই সূত্রে প্রোথিত হলেও সবার আগে সৃষ্টি তারপর মূল্য যাচাই। আদিকবি বাল্মীকি শরাহত ক্রৌঞ্চকে অভিশাপবাণী উচ্চারণ করে উপলব্ধি করছিলেন—এ কোনো শব্দশৃঙ্খলার অর্থসমন্বিত মালা নয়—বরং তা কবিতা। কবিতা তো অনেক রকম হয় তবে ভালো কবিতা প্রথমে হৃদয়ে দোলা দেয় তারপর নমরুদের মশার মতো মাথার ভিতর ভনভন করতে থাকে। কবিতার আধুনিক বা উত্তরাধুনিক আলাপ বাদ দিয়ে আমরা যদি প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে যাই দেখব সেই পাষাণপুরীর অন্ধকার যুগেও মানুষের মনে শিল্পচেতনা ও শিল্পচেতনার সরূপ সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছিল। আঁকা হলো প্রাগৈতিহাসিক মানুয়ের অর্থহীন রেখাপঙ্ক্তি। তাদের অন্ধকার গুহায় পালিয়ে যাওয়া শিকারের ছবি এঁকে তাকে পাকড়াও করার যেদিন মত ও বিমতের উদ্ভব হয়, সেই সন্ধ্যার অন্ধকার গুহায় স্রষ্টা ও বিচারক, শিল্পী ও সমালোচক যে কথা ভেবেছিল তার সাথে আধুনিক বিশ্বের অভিজ্ঞ সাহিত্য সমালোচকের পার্থক্য থাকলেও কিংবা আাধুনিক বিজ্ঞানের সাথে তার বিরোধ থাকলেও স্রষ্টা–সৃষ্টি ও সমালোচকের জন্ম হয়েছিল সেখান থেকেই। শিল্পের জগতে প্রাচ্য–প্রতীচ্য বলে কিছু নেই। শিল্পের বিকাশ ঘটে সমালোচক মনে শিল্পের পরম্পরায়। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন "কাব্যসমালোচকের কাজ হলো ঘটকালির মতো— লেখক ও পাঠকের চারচক্ষুর মিলন ঘটানো। অথবা আদালতের দোভাষী ব্যক্তির মতো— বিচারক আসামির ভাষা বোঝেন না; আসামিও বিচারকের

ভাষা বোঝেন না। মাঝখানে দোভাষী দাঁড়িয়ে কাঠগড়া ও বিচারাসনের যোগাযোগ স্থাপন করা। কার্লাইল বলেছিলেন—'Criticism stands like an interpreter between the inspired and the uninspired.'এখানে Inspired কবি আর Uninspired হলো পাঠক। আলোচক বা সমালোচক বলতে আমি এটুকুই বুঝি। কবিতা লেখার পাশাপাশি কবিতা নিয়ে লেখার নেশা বা আনন্দ কখন কেমন করে কোথায় পেয়ে বসলো আমাকে তার কিছুই আমি আর বলতে পারি না এখন। তবে কোনো না কোনো দিন আমি কবিতা নিয়ে লিখতাম হয়তো; শুধু আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা নিয়ে লিখব বলে। তবে যা কিছু অনিবার্য তা কোনো না কোনোভাবে ঘটেই যায় এটাই প্রকৃতির নিয়ম। আশা রাখছি বইটি তরুণ কবি বন্ধুদের জন্যে উপকারে আসবে। কারণ কবিতা লেখার প্রথম মুহূর্তে আমার মনে যেসব প্রশ্ন জেগেছিল আমি এখানে তা নিয়েই কথা বলেছি। বইটিতে কবিতার থিওরি আমি লিখিনি। কবিতার আত্মা ও শরীর নিয়েই আমার যত কথা। যেন আলোচনাটি বুঝতে সহজ হয় তার জন্যে আমি সমকালের অগ্রজ কবিদের কবিতা ব্যবহার করে তুলনামূলক আলোচনা করার কিছুটা চেষ্টা করেছি। আশা রাখি বইটি পড়ে পাঠক কবিতা বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং কবিতাপাঠে বইটি তার জন্যে সহায়ক হবে। এখানে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার প্রথম কবিতার বই *কুম্ভ ও বিহঙ্গ মৌরিন*-এর সাথে নানাভাবে যারা মিশে আছেন তাদের। বিশেষ করে কবি সারাজাত সৌম যিনি এখন চলে গিয়েছেন অন্ধকার পথে সেই গুহাচারী প্রাচীন জগতে। আলোর পথ থেকে দূরের অন্ধকারে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকুক কবিতা। কারণ আমি জানি একমাত্র কবিতাই তাঁর মুক্তির পথ। এখন তাঁকে আমি কামেল পীর হযরত মাহবুবুল আলম সৌম বলে ডাকি। ভূমিকা না লিখে কেন আমি খণ্ড-ৎ আকারে খিয়ো লিখলাম? খণ্ড–ৎ আকারে খিয়ো তো হয় না। কিন্তু এখানে হয়ে গেল মানে বানিয়ে দিলাম। মূলত এমন না হওয়া থেকে হয়ে যাওয়াকেই কবিতা বলে...

জাকারিয়া প্রীণন
ময়মনসিংহ
২৬ জুন ২০২৩

সূচি

কবিতার মানে ১৩
কবিতার ডালপালা ১৮
ম্যাটারিয়ালিজম; কবিতার জগতে কবি ২৭
ছুরি রহস্যের আদিঅন্ত ৩৬
আবদুল মান্নান সৈয়দ; জন্মান্ধ জাদুকর ৪২
স্বতন্ত্রধারার কবি আল মাহমুদ ৫৪
কবির সোনালি অন্ধকার ৬৪
অলংকার; বাংলা কবিতার সহজ বিশ্লেষণ ৭৩

কবিতার মানে

ভাবনা আমার কাছে দোদুল্যমানতা বা সংশয়। সংশয় ধরে নিলে বলা যায়— ভাবনা জ্ঞানের প্রথম দরোজা। নানান যুক্তি-তর্কের ভিতর দিয়ে তা ক্রমশ পরিবর্তিত হয়; হচ্ছে এবং হবে। দর্শন ও বিজ্ঞানে নজর দিলে তার সত্যতা প্রতীয়মান। কিন্তু কবিতা? —তারও বিবর্তন ঘটে দেহ-কাঠামোর মতোই। মানসিক গঠনের সাথে সাথে বদলাতে থাকে প্রবহমান নদীর মতো। কালচক্রের নানান বাঁকে নোঙর ফেলে। কবিতার যাত্রী সেখানে নূতন এক পৃথিবীর দেখা পায় আপন গরজে। তাই 'কবিতা ভাবনা' নিয়ে বলতে গেলে তা হবে খুব ক্ষণস্থায়ী; মূল্যহীনের কথা— যা কিছু সময় পর বদলে যেতে পারে নতুন কোনো অজানাকে আবিষ্কারের মাধ্যমে। অথবা জন্মদিতে পারে বিতর্কের। কবি জীবনানন্দ দাশ যখন চিত্রকল্পকে কবিতা বলেন —তখন সমকালীন রসবাদী কবিরা উপস্থিত হন নানান যুক্তিতর্ক নিয়ে। আল মাহমুদ সে চিত্রকল্পের পাশে রাখলেন উপমা। বললেন উপমাই কবিতা। পূর্বজ কবিগণের ভাবনাকে মেনে নিয়ে যোগ ও বিয়োগের সূত্র ধরে নূতন নূতন চিন্তার সারবত্তায়; এমন করেই পরিবর্তিত হয় কবিতা। আবার পূর্বজকবিগণের দেখানো পথকে অস্বীকার করে গড়ে উঠতে পারে কবিতার নূতন নূতন দর্শন এবং কবিতা কাঠামো। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ। তাঁর জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছে'র মাত্র এগারোটি কবিতা দিয়ে বদলে দিয়েছেন আমাদের কবিতা ভাবনার জগৎ ও কাল পরিক্রমা। আড়াই হাজার বছরের সাহিত্যে এটি ছিল নূতন একটি বাঁক। কবিতা ভাবনার কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলা যায়। যেহেতু কবিতা নিয়ে নানান রকম এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে এবং নানান ধরনের ভাষা-কাঠামো গড়ে উঠেছে এখন পর্যন্ত। কিন্তু সব কথার সাড়কথা আমি শব্দের ছলনা; ভাব-কল্পের ষড়যন্ত্র

এবং কারুভাষার পৈশাচিক আনন্দকে কবিতা বলে মনে করছি আপাতত। কিন্তু এই সমস্ত লেখা কখনোবা হয়ে যেতে পারে জরাজীর্ণ শব্দ কাঠামো। কিংবা তরল ও সহজবোধ্য— কিন্তু এই সহজ সমীরণে যেই কল্পনার সননাগার চোখে লাগে তাকে বলাযায় ড্রিমন্যাস। যা এক্সপ্রেশনিজমকে বিকৃত করে নিজেকে প্রকাশ করে। আর একটু বাড়ালে বলা যায়— নিজের অন্তর্গত হওয়া; মনকে প্রশ্ন করা! —এবং তার অনুলিখন করে যাওয়া। এই আত্মজিজ্ঞাসাই কবিকে কবিতা রচনা করতে সাহায্যকরে। কিন্তু যিনি কবি তিনি কবিতা লিখেন না —ষড়যন্ত্র করেন। কবি মূলত একটি ভ্রমর ফুলকে আঘাত করে— করে পাখির সাথে পরকীয়া। প্রকৃত সত্য হলো কবিতা যতটা না অধ্যয়নের বিষয়, বোঝার বিষয়; তার চেয়েও বেশি অনুভব ও উপলব্ধির বিষয়। কিন্তু তার আগে কবিতাকে চেনা খুব বেশি প্রয়োজন— যেহেতু সব রচনাই কবিতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়। আমাদের পাঠক বা সমালোচক সমাজের লোকেরা কবিতার একটি Pattern দাঁড় করিয়ে কবিতাকে চেনার চেষ্টা-ফিকির করেন। কিন্তু এই চিরাচরিত আঙ্গিককৌশলের বাইরেও কবিতা উপস্থিত। যে কারণে এই খণ্ডিত দৃষ্টি কবিতার বিশাল এক জগৎকে দেখার আড়ালে রেখে দেয়। পিকাসো বলেছিলেন— 'Everyone wants to understand art. Why not try to understand the songs of a bird? Why does one the night, flowers, everyone around one, without try to understand them?' পিকাসোর এই বক্তব্য কেবল চিত্রশিল্প নয় কবিতার জন্যেও যথার্থ। যে কারণে কবিতাকে সংজ্ঞায়িত করে তার পরিপার্শ্ববোঝার চেষ্টা করেছেন অনেকেই। Samuel Taylor Coleridge; William Wordsworth-এর কবিতা ভাবনাকে এক করে বলা যায়— বহির্জগতের আলোড়ন এবং অভিজ্ঞতার মূর্ছনা যখন কবির অন্তর্গত তাড়নার সংরাগে মিশ্রণ হয় হৃদয়াবেগ; তখন সুতীব্র অনুভূতির হিন্দোল ব্যঞ্জনায় এবং অনিবার্য শব্দদ্যোতনায় যেই রূপ লাভ করে তা-ই কবিতা। প্রাচীন ভারতীয় অলংকারিকদের বিশাল একটি অংশ কবিতা নিয়ে নানান রকম সংজ্ঞা দাঁড় করিয়ে কবিতাকে মার্জিন করতে চেয়েছেন। কিন্তু কবিতা শেষ পর্যন্ত মুক্ত। ধরাবাঁধা কোনো নিয়মে তাকে যেমন আটকে রাখা যায় না তেমনি কবিতা বিষয়ক ভাবনাও চিরায়ত নয়— বরং তা বহু ভঙ্গির। বদলে যেতে থাকে। যেমন গোলাপের গাছটিতে ফুল ঝরে আবারও কলি ফোটে; কোনোটি হয়তো

প্রস্ফুটিত হয় কোনোটি-বা নষ্ট হয় অকালে। কবিতার প্রধান বাহক হলো ভাষা— আবার ভাষাকে বহন করে বা প্রকাশ করে শব্দ। একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যায়:

> বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
> পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

কবি জীবনানন্দ দাশ 'নীড়'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'বাসা' বা 'নিলয়' বা অনুরূপ ভিন্ন কিছু ব্যবহার হয়তো করতে পারতেন। এতে শব্দের আভিধানিক অর্থে কোনো তারতম্য হতো না। কেননা পাখি শব্দের পরে 'বাসা' ব্যবহার 'নীড়'-কেই অর্থদ্যোতিত করত নিঃসন্দেহে। কিন্তু 'বাসা' শব্দ প্রয়োগে কবির উচ্চমার্গ শিল্পমান না থেকে তা বরং গৌণ কবিদের মতোই হয়ে পড়ত। এখানে সংস্থাপিত 'নীড়' শব্দের যে ব্যঞ্জনা—'বাসা' বা অনুরূপ প্রতিশব্দে সেই ব্যঞ্জনা বা শব্দাতিরিক্ত দোলা অনুপস্থিত। 'নীড়' শব্দের ব্যবহার শব্দের কমনীয়তা, লালিত্য, ও দৃশ্যমান চক্ষু-শীতলতা যেমন বর্তমান তেমনি ক্লান্ত পাখির অর্থাৎ মানুষের বা কবির ঘরে ফিরবার ঠিকানারও সন্ধান মেলে। কবিতায় যেই মোহনিয়া শব্দের কথা বলা হয় এখানে 'নীড়' শব্দটি তারই প্রতিনিধিত্ব করছে। অবশ্য কবিতা এই মোহনীয় শব্দের অতিরিক্ত কিছু। একই কবিতায় জীবনানন্দ দাশ 'চোখ' শব্দ প্রযুক্ত করেন তা শুধু চোখের আভিধানিক অর্থেই সীমাবদ্ধ নয়— বরং সেই পাখির নীড়ের মতো চোখ— হাজার বছরের ক্লান্ত—অনিকেত নাবিকের দু'দণ্ড শান্তি প্রার্থনা ও আশ্রয়ের প্রতীক; প্রিয়তমা নারীর প্রেমের আকাঙ্ক্ষা নিভৃতলোক হয়ে ওঠে। অনেকেই ভাব— অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে আবার অনেকে ভাষা— অর্থাৎ শব্দকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় ক্ষেত্রত দুটোই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। ভাব কখনো ভাষাকে ছাড়া যেমন দাঁড়াতে পারে না তেমনি ভাষা— ভাব অবলম্বন করেই নিজের শক্তিকে বিকশিত করে। অনেকে বলে থাকেন কবিতার কোনো মানে হয় না। এই বিষয়টি প্রায়ই আমাকে ভাবিত করে তুলে। প্রশ্ন হয় ভাষা কি তবে অসম্পূর্ণ কোনো কিছু? নাকি ভাষা অর্থপ্রদানে অক্ষম? যদি কবিতাকে আইডিয়োলজির অংশ ধরে নিই তাহলে কোথাও না কোথাও তার নিজস্ব একটি ভাষা আছে— তার কোথাও না কোথাও একটি মানে আছে। তবে এটা আমি মানি যে, কবিতা কোনো কোনো সময় সুনির্ধারিত অর্থ প্রদান করে না। শুধু কবিতা নয় শিল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রই এমন। তাহলে কবিতার মানে খুঁজতে যাবার অর্থ কী? কিংবা কেনই-বা কবিতার

কোনো মানে হয় না? মালার্মে ভাবতেন ভাষা অসম্পূর্ণ, ভাষা অক্ষম। কিন্তু মালার্মের এই কথায় বিশ্বাস রেখে জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়া যায় না। পাঠকের কাছে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় যে দর্শন, আবেগের তাপ থাকে তা খুব একটা অস্পষ্ট থাকে না। তবে তার কিছু কবিতা আছে যা কেবল একটি অস্পষ্ট ধারণাকে প্রকাশ করে। যেমন তাঁর ঘোড়া কবিতাটি। শেষ পর্যন্ত তাও কি অস্পষ্ট? প্রশ্ন হতে পারে। মালার্মে শব্দের যে ঝলকের কথা বলতেন হয়তো সে কারণেই নিজের কবিতার লাইন বুঝতে চেয়েছিলেন অন্যের কাছে। তার মানে হলো গোপনে কোথাও একটু হলেও তিনি বিশ্বাস করতেন ভাষা অক্ষম বা অসম্পূর্ণ কিছু নয়। তাহলে এসব প্রশ্নের কেন উদ্ভব হয়? ধারণা করি চৈতন্যের তন্ময়তা থেকে কবিরা কল্পনার যে শব্দ অবয়ব দেন, তা অধিকাংশে পাঠক কল্পনার বাহিরে লিপিবদ্ধ হয়। যে কারণে কবিকে তার কবিতার অর্থ জিজ্ঞেস করলে অভিমান করেন। তারা সবসময় একজন অনুসন্ধানীপাঠক কামনা করেন। নেরুদার একটি লেখায় লোরকা প্রসঙ্গে লেখেন লোরকার কাছে তার কবিতার মানে জিজ্ঞেস করায় তিনি একজনকে উত্তর দেন— 'কোনো কবির কাছে তার কবিতার মানে জানতে চাওয়া আর কোনো মহিলাকে তাঁর বয়স জিজ্ঞেস করা একই রকম অসভ্যতা।' তার মানে হলো কবিতার মানে আছে এটা সত্য। অনেক কবি আছেন যারা নিজের কবিতার বিষয়ে বলে থাকেন, 'আমি আমার নিজের জন্য লিখি।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার গীতাঞ্জলি নিয়েও এমন কথা বলতেন। তিনি বলতেন 'নিজের মনে কথা বলা।' এসব কথা আপেক্ষিক সত্য ও বাস্তবতা ভিন্ন কিছুর ইশারা করে। নিজের মনের কথা তো সকল কবিই বলেন। একটি কবিতা লেখার পর তা যখন পাঠকের কাছে চলে আসে সেখানে নিজের বলে কিছু আসলে থাকে কি? আবুল হাসান যখন বলেন 'মৃত্যু আমাকে নেবে, জাতিসংঘ আমাকে নেবে না' তা পাঠক মহলে এসে হয়ে উঠে বিশ্বজনতার। তার এই 'জন্ম মৃত্যু জীবনযাপন' কবিতাটি হয়ে ওঠে নির্যাতিত, নিপীড়িত, অধিকারবঞ্চিত প্রতিটি মানুষের প্রতিটি দেশের। সব বির্তকের পর কবিতার দুটি দিক থাকে। এক বাহির মুখ যা আমার কাছে শব্দজগৎ দ্বিতীয়ত ভিতর মুখ যাকে আমি কাব্যজগৎ বা অসীমতা বলে থাকি। এবং এই অসীমতা বা কাব্যজগৎ থেকেই কবিতার মানে পাওয়া সম্ভব। যেমন আমি পড়লাম 'গাঢ় নিশ্বাসের ভিতর একবার মৃত্যুকে ভুলে গেলে আকাশে লেগে যায় চুম্বনের দাগ।' এই কবিতার লাইনটি সুনির্ধারিত কোনো অর্থ প্রদান করছে না। কিন্তু এক ধরনের ইমাজিনেশন তৈরি করছে ফলে এক ধরনের তন্ময়তা আমরা পাই। তাহলে এবার পুরো কবিতাটি পড়ে নেওয়া যাক:

শীতের বাতাস, তুমিও ঘুম যাও। গাঢ় নিশ্বাসের ভিতর একবার মৃত্যুকে ভুলে গেলে আকাশে লেগে যায় চুম্বনের দাগ। তুমি ওষ্ঠাধরের ধারে এসো না। আমাদের শিরা বেয়ে রক্ত বয়ে যাচ্ছে পূর্বের সকল আকাশে। ভোর ভেঙে গেলেই তুমি দেখো আমরা দিগন্তের রং হয়ে গেছি।

নির্ঝর নৈঃশব্দ্যের 'চুম্বনের দাগ' কবিতাটি কোনো আইডিয়া নির্ভর কবিতা নয়। তার শব্দে শব্দে কল্পনার ছোট ছোট চিত্র দেখতে পাই। সহজ করে বলা যায় চিত্রকল্প। যা একটি বিমূর্ত ভাষা নিয়ে হাজির হয় আমাদের সামনে। এই ভাষার কারুকাজে একধরনের পরাবাস্তবতাও লক্ষ করি। মূলত এই পরাবাস্তবতা এই কবিতার প্রধান শিল্প। অনুভবের জায়গা থেকে আমরা এখানে যেমন প্রেমের আনন্দ পাই। যা কবিতার ভিতর মুখ। এবং এটি অর্থময়তার দিক থেকে শূন্য। তার কারণ হলো কবিতাটি বাস্তব ও বিভ্রমের একই সঙ্গে সংযোগকারী ও চূর্ণকারী। চিত্রশিল্পে রেনে ম্যাগ্রিৎ তার চিত্রকলায় এমনটি করতেন। তার মানে এই কবিতা রেনে ম্যাগ্রিৎ দ্বারা প্রভাবিত? এমনটি মোটেও নয়। এটি একটি ফিউশনাল বাস্তবতা। এখন এই কবিতাকে প্রভাবিত কবিতা বললে পৃথিবীতে মৌলিক বলতে কিছুই থাকে না। ফিউশন নিয়ে এখানে আমি কোনো কথা বলব না। যেহেতু অন্য একটি প্রবন্ধে তার আলোচনা করেছি। 'আমাদের শিরা বেয়ে রক্ত বয়ে যাচ্ছে পূর্বের সকল আকাশে।' এখানে যতটা না পরাবাস্তবতা আছে তার চেয়ে আরো ঘনিষ্ঠাভাবে আছে ম্যাজিক রিয়ালিজম। ম্যাজিক রিয়ালিজম সুররিয়ালিজমেরই একটি অংশ। অন্য সব সুররিয়ালিস্ট কবিরা পাঠককে যেমন Hallucination করে এই কবিতা আমাদের তা করছে না বরং একটি স্বপ্নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কবিতাটি পড়তে পড়তে তার আবহে আমরা যেই প্রেমের অনুভূতি টের পাই এটিই এই কবিতার মানে। আবহ সৃষ্টি করাই আমার কাছে কবিতা এই আবহের ভিতরেই প্রোথিত থাকে ইশারা ভাষা। সুতরাং সুনির্ধারিত কোনো অর্থ প্রদান করা কবিতার কাজ নয়— কবিতা আমাদের অস্তিত্বের অন্তর্গত রহস্যের চিত্ররূপদাতা।

কবিতার ডালপালা

কবিতা দীর্ঘ রজনীর পর সকালের নিশ্চয়তা নয়। ঘাতক মৃত্যু কিংবা অন্ধকারের চেয়েও গভীর কোনো ষড়যন্ত্র। প্রগাঢ় অন্ধকার কখনো কখনো চকচকে হতে পারে। এই যে হামলার নামে মানবতার চরম অবনতিতে পৃথিবীর আনাচকানাচে আমরা কবিতা লিখছি। যেন ঠান্ডা ডালে ভাত মাখিয়ে অপেক্ষা করছি কাকের। প্রতিটি মেঘশিরীষের পার্ট খুলে খুলে কবিতা খুঁজে চলছি, স্পর্শ করতে চেয়েছি ভঙ্গিমার প্রতিটি জল। কাগজের দোকান থেকে বাঁধাইখানা— কবিতার দৌড়ঝাঁপের এই মহড়াকে বলা যায় দুপুরের ব্যাবসা-বাণিজ্য। তবুও বৃষ্টিমগ্ন দুপুরে আমরা যথেষ্ট উষ্ণতা অনুভব করি। বাগানের দিকে তাকিয়ে অবলীলায় বলে দিতে পারি ওগো ফুল! ফুটে থাকা বাহারি রঙে তুমি সুন্দর। সুসংহত সবুজ স্কার্ট পরা তরুণীর নাকফুল হয়ে ওঠে কবিতা। শব্দধূম্র বনে গড়াগড়ি যায় আমাদের পাপের আঙুল। যেন সবুজ শুকপোকা নরম ডগায় দাঁত বসাবে বলেই অপেক্ষা করছে রোদের। কবিতা কী? বা কবিতা ভাবনা নিয়ে বলতে গেলে তা হবে ক্ষণস্থায়ী কথা। আজ এই মুহূর্তে যা ভাবছি ক্ষণিকের দূরত্বে নতুন কোনো অজানাকে আবিষ্কারের মাধ্যমে পালটে যেতে পারে। পালটে যায়। মেঘ থমথমে জ্যোৎস্নার মোম গলে গলে ফুরিয়ে যাচ্ছে রাত। নদীটিও খুব একা। তাহলে তুমি কে? একটি প্রশ্নবোধক চিহ্নে দাঁড়িয়ে থাকা আমি গ্রহণ করতে চেয়েছি হৃদয়ের দাসত্ব। সে মতে কবিতা ভাবনা নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই আজ। বরং কবিতার চপলতা নিয়ে অল্প কিছু বলা যেতে পারে। মস্তিষ্কে যে গাছ জন্মেছে তার ফুল, ফল, পতা আমার কাছে কবিতা। সুতরাং কবিতা মনোগামী বৃক্ষ আর আমি তার পাগল— ধুলোয় ডুব মেরে অট্টালিকা বানাই— বানাই পাখিদের বাসা। কোনো এক ঝড়ে উড়ে যাব জেনেও বুনন করি শব্দের ধারাপাত— ফুল তো ঝরে যাবে জেনেই ফুটে থাকে পৃথিবীতে। যে কবিতা শুদ্ধতার স্বীকৃতি পায়

তা অবশ্যই ভালো কবিতা। সচরাচর মনে করা হয়— অভিধাগত ও অভিব্যক্তিগত অর্থের নিখুঁত ভারসাম্যই কবিতা। কাব্য বিবর্তনের ক্রমধারা বলে কবিতা বহুরৈখিক এই সত্যে আত্মসমর্পণ করেই এগিয়ে চলছে কবিতার ক্রমধারা। এই বিশ্বাস বা অস্তিত্বের কারণেই নতুন নতুন কাব্যপ্রকরণ চোখে পড়ে। তার মধ্যে পাঠক সবসময় সন্ধান করে ভালো কবিতার। ভালো কবিতা বলতে আমরা বুঝি সেই কবিতা— যে কবিতা প্রথম পাঠেই পাঠক মন চমকে দেয়— তার চেতনা আবিষ্ট করে কোনো এক রহস্য এবং কবিতাটি ক্রমশ তার আত্মঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে;—
জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা।
অনেক হয়েছে শোয়া;— তারপর একদিন চলে গেছে
কোন দূর মেঘে।
অন্ধকার শেষ হলে যেই স্তর জেগে ওঠে আলোর আবেগে;
সরোজিনী চলে গেল অতদূর? সিঁড়ি ছাড়া—
পাখিদের মতো পাখা বিনা?
হয়তো বা মৃত্তিকার জ্যামিতিক ঢেউ আজ?
জ্যামিতির ভূত বলে ; আমি তো জানি না।
জাফরান— আলোকের বিশুষ্কতা সন্ধ্যার আকাশে আছে লেগে ;
লুপ্ত বেড়ালের মতো; শূন্য চাতুরির মূঢ় হাসি নিয়ে জেগে।

(সপ্তক—জীবনানন্দ দাশ)

সপ্তক সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮) কাব্যগ্রন্থের কবিতা। কবিতাটি পড়ার পর পাঠক মনকে যেমন চমকে দেয় তেমনি গূঢ়চারী রহস্য পাঠক মন আবিষ্ট করে নেয়। এই ধরনের কবিতা মনকে কল্লোলিত করে, দুলিয়ে যায়। চৈতন্য জাগ্রত করে। এই দুলুনি বা সাড়া ভাবের অভাবিত ব্যঞ্জনায় বা মনোভঙ্গির অপ্রত্যাশিত দ্যুতিময় রূপকলার আকস্মিক জ্যোতির্ময়তা যেন। পাঠক মনে এর যেকোনো একটি অভিঘাত ঘটিয়ে কবির কাব্য সৃজন যথার্থ কবিতা হয়ে ওঠে। এখন প্রশ্ন হয়— তাহলে সৎ কবিতা বলতে আমরা কোন ধরনের কবিতাকে বুঝতে পারি? বহুভঙ্গিম কবিতার জগতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়— তবুও একটি নীতিমালা সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হয়। কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে না গিয়ে আমরা সহজে বুঝতে পারি— যে কবিতা কোনো গোপনীয়তাকে স্পর্শ করে না। তার ভাষা কাঠামো বিষয় অনুগামী এবং অর্থ ও ধ্বনি পরস্পর সহঅবস্থানে আত্মবদ্ধ বা সংহত। এই ধরনের